বাংলা প্রকাশনা ও তথ্য প্রকাশনা
বাদল বসু

বাংলা প্রকাশনার জগতে এখন তথ্যপ্রযুক্তি শব্দ অত্যন্ত পরিচিত একটা শব্দ। মান্ধাতার আমলের লেটার প্রেস বা লাইনো মেশিনের কালিঝুলি মুছে বাংলা প্রকাশনা এখন ঢুকে পড়েছে ঝাঁ-চকচকে সাইবার যুগের নতুন দুনিয়ায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা কম্পোজিটরদের সেকেলে ছবিটা পালটে এখন ডিটিপির যুগে ঝলমলে কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন কম্পোজিটার। তাঁর চোখ মনিটরের পদায়। আঙুল ঝড় তুলেছে কীবোর্ডে। আর শুধু কম্পোজিটরই বা কেন, লেখক থেকে প্রকাশক সকলেই এখন কম্পিউটারের সামনে বসে মাউস ক্লিক করতে সদাব্যস্ত। 'তথ্যপ্রযুক্তি'র এমনই ম্যাজিক। অথচ, আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে, আমি যখন বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার জগতে, আমার কর্মক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছিলাম তখন এখানকার চেহারাটা ছিল একেবারে অন্যরকম।

সেটা ছিল লেটার প্রেসের যুগ। সিসের অক্ষর কাঠের কেসের মধ্যে সাজানো থাকত। সেই কেসের মধ্যে থেকে কম্পোজিটররা অক্ষরগুলোকে নিয়ে কম্পোজিং-স্টিকে সাজাতেন। তারপর সেগুলো রাখা হতো গ্যালি আকারে কতগুলো কাঠের পাটাতনে। প্রুফ সংশোধনের বেশির ভাগ কাজটা ওই গ্যালি আকারেই সারা হতো। প্রুফ সংশোধনের পর করা হতো পেজ মেক আপ। তারপর ছাপার পালা।

ছাপা শেষ হলে আবার ওই পেজ মেক আপ ভেঙে অক্ষরগুলোকে কাঠের কেসের মধ্যে যথাস্থানে রাখতে হতো পরবর্তী কম্পোজের জন্য। এর মধ্যে কতগুলো অক্ষর বার বার ছাপার কাজে ব্যবহার করার ফলে যেত ভেঙে। সেগুলোকে পালটে ফেলতে হতো। কখনো আবার কম্পোজ করতে গিয়ে কম পড়ত কোনো অক্ষরের। তখন সিসের তৈরি সেই সব অক্ষর কিনে আনতে হতো ওজন দরে। সব মিলিয়ে একটা বিরাট কমকাণ্ড– টাইপ, কেস, গ্যালি, র‍্যাক-এ ভর্তি থাকত প্রেসের ঘর। সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে– আজকে তথ্যপ্রযুক্তি এসে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার জগতে কি বৈপ্লবিক পরিবর্তনটা ঘটিয়েছে সেটা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়।

পরবর্তী কালটা ছিল লাইনোর যুগ। বাংলায় সেটা খুব বেশি প্রেস গ্রহণ করতে পারে নি, কারণ সেটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। আমাদের গৌরাঙ্গ প্রেসে বসানো হয়েছিল লাইনো মেশিন। তাতে সিসে গলিয়ে পুরো ম্যাটারের একটা ছাঁচ তৈরি করে ছাপা হতো। এই পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অনেক বেশি ম্যাটার ধরানো সম্ভব হতো। এই পদ্ধতিতে ছাপা খুবই ভাল হতো কিন্তু প্রুফ সংশোধনের বিষয়টিতে একটু সমস্যা ছিল। কারণ এখানে একটা শব্দ ভুল থাকলে পুরো লাইনটা তুলে নতুন করে করতে হতো। পরবর্তীকালে লেটার প্রেসে মনোটাইপে লাইনো ফেস বেরিয়েছিল। লাইনো মেশিনে কম্পোজিং পদ্ধতি বদলাল। কিন্তু ছাপার ব্যাপারটা মোটামুটি একই রইল– যাকে ছাপাখানার ভাষায় বলা যায় ডাইরেক্ট প্রিন্টিং - যেখানে কালি মাখানো সিসের হরফ সরাসরি কাগজের ওপর ছাপছে। এটাও কিন্তু লেটার প্রেস।

পরবর্তীকালে অফসেটে কিন্তু ছাপার পদ্ধতি বদলাল। এখানে নেগেটিভ বা পজেটিভ থেকে প্লেট তৈরি হয়। প্লেটে কালি লাগানো হয়। প্লেটের কালি লাগে রাবার

ব্ল্যাঙ্কেটে, তা থেকে কাগজে।

একইভাবে কম্পোজিং-এর পদ্ধতি বদলাল কম্পিউটার আসাতে—এল ফটো টাইপ সেট। (PTS) এবং Laser Printing। এতে কম্পোজিং-এর কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে এবং প্রকাশনা হয়েছে Desk Top যাকে আমরা বলি DTP। একটি কম্পিউটার নিয়ে পুরো Pre Press Job সেরে ফেলা যাচ্ছে। লেটার প্রেসের যুগে যে অনেকখানি জায়গা লাগত তা লাগছে না। টাইপ কম পড়ার ভয় নেই। ভাঙা টাইপ কথাটি উঠে গেছে। বিভিন্ন পয়েন্টের অজস্র আকারের, বিচিত্র রকমের টাইপ ফন্ট অপেক্ষা করে আছে শুধু একটি বোতাম টেপার অপেক্ষায়। শুধু তাই নয়, সমস্ত কম্পোজ করা ম্যাটার কম্পিউটারে স্টোর করে রাখা যাচ্ছে। তার ফলে একই ম্যাটার বারবার কম্পোজ করার প্রয়োজন পড়ছে না।

প্রুফ-রিডিং এর ক্ষেত্রেও একটা অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কম্পিউটারে। মাউস ক্লিক করলেই ইংরেজি, বাংলা দুটি ভাষাতেই বানান চেক করে নিয়ে কারেকশন করে নেওয়া যাচ্ছে। বিশেষ কিছু সফটওয়্যার পালন করছে প্রুফ-রিডারের দায়িত্ব।

কম্পিউটারের মায়ায় বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার জগতে একটা পরিবর্তন যে এসেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উডকাট, স্টিল এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, হট মেটাল, ফটো এনগ্রেভিংও এইসব এখন আগের যুগের প্রথা। মুদ্রণ জগতের সর্বশেষ প্রযুক্তির নাম CTP। কম্পিউটার টু প্লেট। মনিটরের স্ক্রিনে কম্পোজ করা ম্যাটার এখন সরাসরি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

বইয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রকাশনের জগতে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বইয়ের প্রচ্ছদ। শিল্পীর ব্যবহার করা যে কোনো রঙ, যে কোনো লেটারিং, যে কোনো লে-আউট এখন কম্পিউটারে স্ক্যান করে তুলে আনা সম্ভব বইয়ের প্রচ্ছদে। কেবলমাত্র হাতে আঁকা ছবির বদলে শিল্পীরাও এখন কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন নানা ধরনের বইয়ের প্রচ্ছদ। এক হাতে তুলি আর এক হাতে মাউস নিয়ে এখন কাজ করতে বসছেন বাংলা বইয়ের কোনো কোনো প্রচ্ছদশিল্পী। কম্পিউটার এসে পালটে দিয়েছে শিল্পীর কাজের টেবিলটাকেও।

এই পরিবর্তন অবশ্য শুধুমাত্র কারিগরি ক্ষেত্রেই নয়,বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও বাংলা প্রকাশনকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সাইবার যুগে সুবিধেগুলো প্রকাশনার ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে তা হলো ই-মেল, ইন্টারনেট, এবং ই-কমার্সের মাধ্যমে বাণিজ্যিক লেনদেন ইত্যাদি নানা বিষয়। কিছুদিন আগে যখন আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তসলিমা নাসরিনের *ফরাসি প্রেমিক* উপন্যাসটা বেরোবে ঠিক হলো তখন পুরো পাণ্ডুলিপিটাই এসেছিল ইন্টারনেটে। না হলে স্টকহলম থেকে ওই পাণ্ডুলিপি আসতে যা সময় লাগত তার মধ্যে পুরো বইয়ের কাজ শেষ করে ফেলা যায়। একই ভাবে— ওই বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করার সময় আমাদের হাতে তসলিমার সাম্প্রতিক কোনো ছবি ছিল না। তসলিমাকে ই-মেলে সেটা জানাতেই ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের সদ্য তোলা একটা ছবি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠাল। আমরা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ডাউনলোড করে নিলাম শুধুমাত্র ফোটোগ্রাফ নয়, সেই ফটোর স্ক্যান পজিটিভ-ও। আগেকার দিন হলে হয়ত তসলিমার পুরনো ছবি দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হতো।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কবি জয় গোস্বামী তখন আমেরিকার আইওয়া বিশববিদ্যালয়ে। ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ালর্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস

হওয়ার কদিন বাদে ই-মেল-এ পেলাম জয়ের একটা চিঠি— 'BADALDA EKTA KOBITA PATIECHI' এরপর ইন্টারনেটে পেলাম ওর দীর্ঘ কবিতা। ওর হাতের লেখাতেই। ওর কাছে বাংলা টাইপ না থাকায় হাতের লেখাটাই স্ক্যান করে পাঠিয়েছে। এটাই সেই ওয়ালর্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ঘটনার পর জয়ের লেখা বিখ্যাত কবিতা 'কবন্ধের চোখ'— যা পরে দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

ই-মেল, ইন্টারনেটের ফলে একজন লেখক যেমন বহুদূর থেকে তাঁর পাণ্ডুলিপি নিমেষে পাঠাতে পারছেন, আমরাও তেমন এখানে বসেই কম্পিউটারে তা সম্পাদনা করে, লেখককে দেখিয়ে, পেজ মেক আপ করে পজিটিভ পর্যন্ত বের করে নিতে পারছি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখক, সম্পাদক এমনকী টেকনিক্যাল পার্সোনালিটির দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারছি। সময় সংক্ষেপও হচ্ছে।

বাণিজ্যের দিক থেকে সুবিধে হয়েছে অনেক। প্রকাশকরা নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলেছেন। সেখানে তাঁদের বিভিন্ন বইয়ের নাম, দাম, পরিচিতি এমনকী প্রচ্ছদের ছবিও দেওয়া থাকছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের পাঠক ওয়েবসাইট খুলে দেখতে পারেন। তাঁর পছন্দের বইটি অর্ডার দিতে পারেন। বহু সংস্থাই ই-কমার্সের সঙ্গে যুক্ত। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্রেতা-কার্ডের মাধ্যমে দামও মিটিয়ে দিতে পারেন। ঘরে বসেই। বইটিও যথাসময়ে তাঁর কাছে পৌছে যাবে। পাঠক ও প্রকাশকের যোগসূত্রটা আরও সহজ হয়ে উঠেছে এই সাইবার যুগে। আমি যে প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত সেই আনন্দ পাবলিশার্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট, ই-মেল রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্ডার পাই, বহু মতামতও পাই—যা থেকে আমরা নিজেদের সমৃদ্ধ করে নিতে পারি।

তবে সব কিছুর যেমন সুবিধে অসুবিধে, ভালো খারাপ দু-ই থাকে—এরও আছে। প্রথমত, এই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মুদ্রণ-প্রকাশনার এই যে এতসব সুবিধে—এসব এতই ব্যয়সাপেক্ষ যে সমস্ত প্রকাশকের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আবার যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরাও ইংরেজি-প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি যে ব্যাপক মাত্রায় এর সুযোগ গ্রহণ করছে ততটা বিস্তৃতভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ নানা ধরণের কারিগরি অসুবিধে আছে। প্রকাশনার দিক থেকে প্রধান সমস্যা হল বাংলা ফন্টগুলো universal নয়। কারও আছে ইন্টারনেটে পাঠানো পাণ্ডুলিপি যে ফন্টে কম্পোজ হয়েছে তা যদি না থাকে সে ওই পাণ্ডুলিপি ডাউনলোড করতেই পারবে না। একই ভাবে ইংরাজি প্রকাশকরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে বিরাট বাজার ধরতে পারবেন তাতে তাঁদের প্রয়োজনীয় খরচ পুষিয়ে যাবে। কিন্তু বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব ?

'তথ্যপ্রযুক্তি'র কারণে দ্বিতীয় যে অসুবিধের মুখোমুখি হচ্ছেন প্রকাশকেরা তা হল জাল-বই নির্মাতাদের রমরমা। আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বইটির প্রচ্ছদ, ভেতরের পাতা সমস্তটা ফটোকপি করে নেওয়া যাচ্ছে। আসল প্রকাশকের বইটা বের করতে যেসব খরচ হয়েছে, যেমন কম্পোজের খরচ, প্রুফ দেখার খরচ, শিল্পীর পয়সা, লেখকের টাকা ইত্যাদির কিছুই ব্যয় করতে হয় না 'জাল' প্রকাশককে। সে তো কম দামে বাজারে বই বেচতেই পারে। আগেকার অনুন্নত মুদ্রণ ব্যবস্থায় এত সহজে, এত অল্প ব্যয়ে, এল অল্প সময়ে বই জাল করা যেত না।

এরই পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে—ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি এসে প্রকাশন বাণিজ্যের যেমন সুবিধে করেছে, তেমনই মানুষকে বই বিমুখ করে তুলেছে। কেবল তথ্যেরই প্রতি

মানুষের আকাঙ্ক্ষা এত বেড়ে উঠছে যে অনেকে মনে করেন পরিশ্রম করে বই লিখবেন, পাঠক সময় ব্যয় করে পড়বেন— এত ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার দরকার কী? কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করলেই তো তথ্য চোখের সামনে হাজির। তার উপরে রয়েছে ইন্টারনেটে সার্ফিং আর চ্যাটিং- এর মতো আকর্ষণীয় বিষয়। এ-সবের মাঝখানে বই কি সত্যিই হারিয়ে যাবে? তথ্যপ্রযুক্তির এই বিকাশ-বিস্তারের যুগে সারা বিশ্বের তথ্য ভাণ্ডার আমাদের হাতের মুঠোয়, তা আমাদের বুদ্ধিকে শাণিত করবে ঠিকই কিন্তু মনকে তৃপ্ত করতে পারবে কি? মাউস ক্লিক করে ইন্টারনেটে পুরো রবীন্দ্র-রচনাবলী পাওয়া গেলেও তা পড়ে কি মন তৃপ্ত হবে, না চোখ স্বস্তি পাবে?

এ ব্যাপারে আমি অবশ্য খুবই আশাবাদী। এতদিনের অভিজ্ঞতায় গ্রন্থ জগতের নানান সংকটকে বারবার দেখেছি। কিন্তু এ-ও দেখেছি যে বই পড়ার অভ্যেস মানুষের চিরন্তন— তাই বইয়ের পাঠক কোনোদিন কমে যায় নি। এক সময় অনেকেরই মনে হয়েছিল টেলিভিশন মানুষকে পুস্তক বিমুখ করে দেবে। কই? এতবছর তো পেরিয়ে গেল, বইয়ের প্রকাশ কি কমেছে? আমার তো মনে হয় কখনো কখনো টেলিভিশন ও বই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। আমাদের বহু বইয়ের বিক্রি বেড়েছে সিনেমা বা টেলিভিশনে সেটা চিত্রায়িত হওয়ার পর। তাই আমার বিশ্বাস তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধেটুকু মানুষ ঠিকই ব্যবহার করবে কিন্তু তাই বলে তার চিত্তবিকাশের যে ধারাটি বইয়ের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছে এতদিন— তাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না।